Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, January 2025, Page No. 75-81
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নির্বাচিত গল্পে দাম্পত্যের ভাঙাগড়া: প্রেক্ষিত দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মৌসুমী পাত্র, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2025; Accepted: 28.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India achieved its independence through partition. Partition was supposed to be a means of eradicating communalism, but in practice, it didn't. The partition took place in the context of the horrific communal riots, and even later, the path of independent India began with the consequences of the same conflicts of the past. After independence, when the geographical separation was transformed into a permanent religious division by transferring Hindus and Muslims on both sides of the border, the problem became more intricate, and communal riots spread out everywhere. Despite beginning its journey as a secular nation, independent India encountered numerous challenges to maintaining communal harmony and coexistence, leading to the impact of communal riots on the Indian population. Partition and the communal riots that associated with it stabbed the life of the nation into pain, despair, oppression and lamentation. Similar to the profound and far-reaching sorrow caused by the partition, communalism has also endangered social civilization. Literature, particularly short stories, evolves with its time and reflects the contemporary issues and crises with great sincerity. As a result, the negative repercussions of the communal riots that took place in India at different eras, along with its violent and vicious manifestations, have emerged in short stories written in different Indian languages by several Indian authors. In most of these stories written in connection with partition and communal riots, the common themes that have emerged as displacement due to the partition and riots, mass migration, genocide, looting, women's oppression, the suffering of children and the elderly, the suffering of men and women, and the smashed form of men's and women's marital lives. This article explores the nature of the dissolution of intimate relationships between men and women in short stories written in several Indian languages in context of partition and communal riots. In this instance, a number of relevant stories in different Indian languages are taken into consideration in order to highlight the specific issue.

Keywords: Partition, Communal Riots, Marital Relations, Short Stories, Hindu-Muslim

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসে দেশভাগের মধ্য দিয়ে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশভাগকে স্বাধীনতা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে মনে করা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। দেশভাগের পরও অতীতের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ, হিংসা, হানাহানির জের নিয়েই শুরু হয়েছিল স্বাধীন ভারতের নতুন যাত্রা। স্বাধীনতা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রে পৃথক হয়ে যাওয়া সীমান্তের দু'পারের হিন্দু মুসলমানকে এপার-ওপারে স্থানান্তর করে ভৌগলিক

বিভাজনকে স্থায়ী ধর্মীয় বিভাজনের রূপ দেওয়া হলে সমস্যা আরও জটিল হয়, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বলা ভালো, দ্বিজাতি তত্ত্বের দাবির বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে হিন্দু মুসলমান রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে দেশভাগ-দেশত্যাগ তথা বাধ্যতামূলক অভিবাসন অন্যদিকে সীমাহীন নিষ্ঠুর হানাহানি ও হিংসা জাতির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দাঙ্গা শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের চেতনায়। তাই স্বাধীনতার এত বছর পরেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। সাম্প্রদায়িকতা নামক ব্যাধি থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারেনি বরং বহুধর্মের দেশ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি সংঘাত সংঘর্ষ স্থায়ী রূপ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সীমাহীন বর্বরতা ও হিংসার অভাবনীয় বহিঃপ্রকাশ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাস থেকে তৈরি হওয়া সামাজিক বুননকে ছারখার করে দেয়। দেশ বিভাজন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুতি, গণহিংসা, লুণ্ঠন, বিতাড়ণ, পলায়ন, খুন, জখম, নারী নির্যাতন, নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত ছোটোগল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগজনিত বাস্তুচ্যুতি, গণপ্রব্রজন, গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, নিপীড়ন বহু গল্পের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। আবার দেশভাগের অব্যবহিত পরে বহির্জগতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, হিংসা ও বিদ্বেষের আবহে নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবন কতখানি প্রভাবিত হয়েছে তাও বহুগল্পের উপজীব্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংকটলগ্নে অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর আঘাতে বহু নারী-পুরুষের জীবনে নির্মম পরিণতি নেমে এসে নারী-পুরুষের যৌথ জীবনকে বিপন্ন করেছে। এই সংকট মুহূর্তে বিপরীত ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নারীর দেহকে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে অপবিত্র করা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে পরাস্ত করার একটি কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উন্মাদনার সময় নারীদেহকে দখল ও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে পুরুষতন্ত্র আক্রমণমুখী হয়ে উঠলে বহু নরনারীর যৌথ জীবনও বিপর্যস্ত হয়েছে— নষ্ট হয়ে গেছে তাদের দাম্পত্য। আবার এই ঘৃণা ও হিংসার আবর্তেই দেখা গেছে অসাম্প্রদায়িক সহৃদয় মানুষের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায়, সর্বোপরি উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন রসায়ন — এই সমস্ত বিষয়েরই নান্দনিক রূপায়ণ ঘটেছে দেশভাগ ও দাঙ্গাজনিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ছোটোগল্পে। আলোচ্য প্রবন্ধে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবর্তে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল তা আলোচনা করা হবে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ছোটোগল্প অবলম্বনে

উর্দু ভাষায় রচিত *'লাজবন্তী'* গল্পে দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তীতে সুন্দরলাল হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত দেশ ভারতবর্ষে আসতে পারলেও তার স্ত্রী লাজবন্তী অপর সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের দ্বারা অপহৃত হয়ে পাকিস্তানেই থেকে যায়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অপহৃতা নারীদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে দু'দেশের অনেক নারীই নিজেদের পরিবার-পরিজনদের ফিরে পায়। পাকিস্তান থেকে বহু নারী সুন্দরলালের গ্রামে ফিরে এলেও লাজবন্তী ফিরে আসে না। বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুন্দরলালের মনে তার স্ত্রীর ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। সুন্দরলাল পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা নারীদের নিজেদের সংসারে পুনর্বাসিত করার চেষ্টায় নিবিষ্ট হয়। ইতিমধ্যে আকস্মিক ভাবেই ফিরে আসে লাজবন্তী। ওয়াগা সীমান্তে লাজবন্তীকে দেখে সুন্দরলালের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে আসে। দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের কারণে সুন্দরলালের মনে লাজবন্তীকে কেন্দ্র করে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আদর্শায়িত পুরুষ সুন্দরলাল স্ত্রীকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের কোমল অনুভূতিগুলো ততদিনে নষ্ট হয়ে গেছে। লাজবন্তীকে সুন্দরলাল দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মাঝে যা অত্যন্ত বেমানান। সুন্দরলাল অত্যাচারিতা নারীদের পুনর্বাসন কমিটির নেতা অথচ সে তার অপহৃতা স্ত্রীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে পারল না। সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার লাজবন্তীকে সুন্দরলাল দেবী সম্বোধন করে সংসারের স্থান দিলেও হৃদয়ে স্থান দিতে পারেনি। লেখক যথার্থই বলেছেন —

> "সবকিছুই সে ফিরে পেয়েছে, অথচ হারিয়েও গেছে সবকিছুই—সে, পুনর্বাসিতা, ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে।"[১]

দেবী রূপে লাজোকে গ্রহণ করলে সুন্দরলাল ও তার স্ত্রী লাজবন্তীর মধ্যে এক অগম্য দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এভাবেই দুটি নারী পুরুষের অন্তরঙ্গ দাম্পত্যকে স্থবির করে দেয় এবং একই সাথে দুটো মানুষের যাবতীয় স্বপ্ন, সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটল সাম্প্রদায়িকতার নিষ্ঠুর আঘাতে।

হিন্দি ভাষায় রচিত গুরমুখ সিং জিতের *‘ঠান্ডা প্রাচীর’* গল্পেও দেখা যায় দেশভাগের সমকালীন সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে ভেঙে যাওয়া দাম্পত্যের ছবি। দেশভাগ পরবর্তীতে চন্দ্রকান্তার পরিবার সদ্য জাত পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে চলে আসে কিন্তু দাঙ্গাবাজরা তুলে নিয়ে যায় চন্দ্রকান্তাকে। ঘটনাচক্রে চন্দ্রকান্তা আশ্রয় পায় পাকিস্তানেরই এক মুসলিম পরিবারে। সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে সে ওই মুসলিম পরিবারের যুবক নিসার আহমেদকে ভালোবেসে বিয়ে করে। হিন্দু ধর্মের যাবতীয় সংস্কার অভ্যাস ভুলে ধর্মান্তরিত হয়ে নিসার আহমেদের সঙ্গে গড়ে তোলে ভালোবাসার সংসার। তাদের জীবনে আসে দু’সন্তান। পরিবারের সকলের ভালোবাসায় দু’সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে চন্দ্রকান্তার যখন সুখের সংসার তখনই তার ওপর নেমে আসে পাকিস্তান সরকারের কড়া আদেশ – জন্ম সূত্রে হিন্দু হওয়ায় তাকে চলে যেতে হবে তাদের জন্য নির্ধারিত দেশ হিন্দুস্থানে। ফলে চূড়ান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে স্নেহ ভালবাসাময় বন্ধন ছিন্ন করে চন্দ্রকান্তাকে হিন্দুস্থানে চলে আসতে হয়। চন্দ্রকান্তা চলে আসতে বাধ্য হলেও মন পড়ে থাকে তার স্বামী সন্তানের দেশ পাকিস্তানে। তার হতাশাগ্রস্ত এক খন্ডিত সত্তা কেবল হিন্দুস্থানে পৌঁছায়। স্বামী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্রকান্তা দুঃখে যন্ত্রণায় জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ ও জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে। স্বামী নিসার আহমেদের সঙ্গে কাটানো অতীত জীবনের প্রেমময় স্মৃতি তার বর্তমানকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার আত্মিক সংকট নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে –

> “দু’বছর হয়ে গেল, এখানে আসার পর থেকে এক রাতের জন্যেও আমি ঘুমতে পারিনি, সন্তোষ। এমন কি দিনের আলোতে আবছা লোহার পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে নিসার আহমেদ যেন আমার সঙ্গে কথা বলে। কান পাতলেই ওর কথা শুধু আমি শুনতে পাই।”[২]

অপরদিকে চন্দ্রকান্তাকে হারিয়ে তার স্বামী নিসার আহমেদ ও তাদের সন্তানেরাও চরম অসহায়তার সম্মুখীন হয়। দু’সন্তানসহ চন্দ্রকান্তা ও নিসার আহমেদের সুখী দাম্পত্য সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও গল্পের শেষে চন্দ্রকান্তার বন্ধু সন্তোষ ও তার বাবা ঈশ্বরদাসের তরফ থেকে কান্তা ও নিসার আহমেদের ভেঙে যাওয়া দাম্পত্যকে জোড়া লাগানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তারা চন্দ্রকান্তার পরিচয় গোপন করে তাকে পাকিস্তানে তার স্বামী সন্তানদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু গল্পের পরিণতিতে চন্দ্রকান্তা ও নিসার আহমেদের সুখী দাম্পত্যের আর কোনো ছবি পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হয় না।

বাংলা ভাষায় লেখা জ্যোতির্ময়ী দেবীর *‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’* গল্পে সাম্প্রদায়িকতার নিষ্ঠুর আঘাতে সুদাম ঋষি ও দুর্গার নিবিড় দাম্পত্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ হয়। দেশভাগের সমকালীন প্রত্যক্ষ হিংসায় সুদাম ঋষিও দুর্গা পূর্ব-বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গের পথে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তারা দুই বাংলার সীমান্তে পৌঁছে চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ভিসা পাসপোর্ট না থাকায় এবং সেলামি বা নজর দিতে না পারায় সুন্দরী স্ত্রীকে বিধর্মী স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় রেখে সুদামকে বেরিয়ে পড়তে হয় টাকা জোগাড়ের সন্ধানে। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সুদাম ঋষি ফিরে না এলে দুর্গা অপর সম্প্রদায়ের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে এবং এর পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন দুর্গা আত্মসম্মান রক্ষার্থে আত্মহত্যা করে। অতঃপর সুদাম ঋষি ফিরে এসে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে শোকে পাথর হয়ে যায়। দুর্গার মৃত্যুর খবর তার সংবেদনশীল মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। স্ত্রীকে হারিয়ে ঋষির অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে লেখক বলেছেন –

> “সে জন্তুর মতো ব’সে থাকে। কারুর কাছে যায় না। কোনো কথাও কানে যায় না তার। এক-একবার বনের দিকে, যাওয়া-আসার পথে লোকের বিরাম নেই। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে দুর্গাকে খোঁজে।”[৩]

চারিদিকে সে স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াতে থাকে। সে ভাবে হয়তো অপর সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজরা তার স্ত্রীকে লুকিয়ে রেখেছে, তাই সে স্ত্রীকে ফিরে পেতে স্টেশনমাস্টারের কাছে মুসলিম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করে। কারণ মুসলমানরা কখনোই অপর একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির স্ত্রীকে ঘরে আটকে রাখে না কিন্তু শেষ অবধি

সুদামের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অসাম্প্রদায়িক দুটি মানুষের জীবন সাম্প্রদায়িকতার কঠিন আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল— একজনের ঠাঁই হল মৃত্যুর কোলে অন্যজন মৃত স্ত্রীর স্মৃতিকে আঁকড়ে অসহনীয় যন্ত্রণাময় জীবন কাটাতে বাধ্য হল।

হিন্দি ভাষায় রচিত অজ্ঞেয়ের *'রমন্তে তত্র দেবতা'* গল্পটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা। কথক ও তার প্রতিবেশী শিখ সর্দার বিশন সিং-এর কথোপকথন সূত্রে গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সর্দার বিশন সিং এক অনভিপ্রেত ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত শহরে ধর্মতলার কাছে একটি যুবতী মেয়েকে কাঁদতে দেখে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান। জানতে পারেন মহিলাটি স্বামীর সঙ্গে পথে বেরোলেও ঘটনাচক্রের স্বামীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিশন সিং দাঙ্গা-উন্মত্ত শহরে মহিলাটির নিরাপত্তার কথা ভেবে বালীগঞ্জের গুরুদোয়ারে তার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেন। পরের দিন সকাল বেলায় তাকে স্বামীর বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখেন বাইরে রাত কাটানোর অপরাধে তার স্বামী তাকে স্ত্রীর সম্মানে ঘরে তুলতে রাজি নয়। মেয়েটি গুরুদোয়ারাতে রাত কাটানোয় তার স্বামী খুব সহজেই ধারণা করে নেয় মেয়েটি অপর সম্প্রদায়ের লালসার শিকার তাই সে মেয়েটিকে খুব সহজেই বলে —

> "... জানি না, রাত্রে তুমি কোথায় থেকেছ, সকালে এখানে আসতে তোমার লজ্জা করল না?"[৪]

সাম্প্রদায়িকতা আক্রান্ত কুটিল সময়ে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই অমূলক সন্দেহ উভয়ের দাম্পত্যে দুর্মর প্রাচীর রূপে খাড়া হয়। পরবর্তীতে গুরুদোয়ারের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করলে স্ত্রীকে ঘরে তুলতে রাজি হয় ঠিকই কিন্তু স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয় না। প্রতিক্রিয়া হিসেবে মেয়েটির উপর নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। মেয়েটি বাধ্য হয় স্বামী সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে— ভেঙে যায় তাদের দীর্ঘ লালিত দাম্পত্য সম্পর্ক।

হিন্দি ভাষায় রচিত পদ্মা সচদেবের *'গোরে বহিনজি'* গল্পে আছে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে এক নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা-গড়া ও জীবন সংগ্রামের কথা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরে বহিনজি দেশভাগের আগে অধুনা পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাবা-মা বৌদিকে হারায়। বৌদিকে চোখের সামনে সম্ভ্রমরক্ষার্থে আত্মহনন করতে দেখে সে নিজেও দাঙ্গাবাজদের অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কুঁয়োয় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাকে বাঁচিয়ে নেয় তারই প্রতিবেশী-বন্ধু হামিদা। আসলে মুসলিম মাত্রই হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকারক ও সংহারক তা নয় বরং কেউ কেউ ভালোবাসে, আগলে রাখে, আশ্রয় দেয় বিপদে পরিত্রাতা বা ত্রাণকর্তা হয়ে দাঁড়ায়। মিনা বা গোরে বহিনজির ক্ষেত্রে হামিদা এবং তার পরিবার তার পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা বহিনজিকে দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করে নিশ্চিন্ত-নিরাপদ ও সন্তোষজনক জীবন উপহার দেয়। পরবর্তীতে হামিদার পরিবার তাকে ধর্মান্তরিত করে এবং হামিদার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। গোরে বহিনজি মিনা থেকে আমিনা হয়ে ওঠে। হামিদার ভালোবাসায় আমিনা সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে সুখে দিন কাটায়। পরিবারের সকলের ভালোবাসায় স্বামী ও দু'সন্তানকে নিয়ে তার সুখের যাপনে ধর্ম কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সুখ শান্তিময় জীবনের কথা সে অকপটে জানিয়েছে —

> "... কীভাবে একদিন মৌলবি এসে আমাকে কল্মা পড়ালেন, আমি আমিনা হয়ে গেলাম, কখন দুটি সন্তান এল— কখন আমিনা দুলহন হলাম— আমি জানি না। হামিদা আমায় ভালোবাসত। তার ভালোবাসা আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল।"[৫]

—এই ভালোবাসা চিরস্থায়ী হয়নি। দেশভাগের কয়েক বছর পর যখন দুই দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, দুই দেশে থেকে যাওয়া বিপরীত ধর্মের নারীদের উদ্ধার করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বা পুনর্বাসন দেওয়া হবে তখন আমিনার জীবনে নেমে আসে নির্মম পরিণতি। সরকারি সিদ্ধান্তে তাকে স্বামী সন্তান পরিবার ফেলে ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়। সাম্প্রদায়িকতা নিষ্ঠুর করাল গ্রাস গোরে বহিনজি তথা আমিনাকে তার স্বামী সংসার থেকে পৃথক করে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। কেবলমাত্র

জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়ার কারণে তাকে স্বামী সংসার পরিত্যাগ করে, প্রেম ভালোবাসায় পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কের যাবতীয় বন্ধনকে তুচ্ছ করে হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে চলে আসতে হল। শুধুমাত্র ধর্ম আলাদা বলে দুজন এই নির্বিরোধী, নিরীহ মানুষের নিবিড় দাম্পত্য ছিন্ন হল। ভারতবর্ষে এসে গোরে বহিনজির জীবন সহজ হয়নি। পাকিস্তানে ফেলে আসা তার দুই শিশুসন্তান ও প্রিয় স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আরও একটি নতুন সংসার তাকে শুরু করতে হয়। তার মৃত বোনের বরের স্ত্রী হয়ে মিনাকে ঢুকতে হয় তার বোনের সংসারে — গড়ে ওঠে নতুন দাম্পত্য কিন্তু স্মৃতিতে থেকে যায় অতীত জীবনের কথা। সাম্প্রদায়িকতা সূত্রে বিভাজন গোরে বহিনজির মত শত সহস্র নারী-পুরুষের জীবন এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রদায়িকতা চিরকালই মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর ও হানিকর— এই সত্যই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

উর্দু ভাষায় রচিত ইসমৎ চুগতাই রচিত *‘বাচ্চা’* একটি অন্য স্বাদের গল্প। গল্পটিতে দেখা যায় একটি নাম পরিচয়হীন অনাথ বাচ্চাকে ভালো রাখার শর্তে দুটি ভিন্নধর্মী মানুষ তাদের জাতি-ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে এক হয়েছে, শুরু করেছে তাদের একত্রে পথ চলা। গড়ে উঠেছে তাদের নতুন দাম্পত্য। দাঙ্গা আক্রান্ত শহরে এক নির্জন রাতে রশীদ একটি বাচ্চাকে কুড়িয়ে পায়, সেবা শুশ্রুষার মাধ্যমে তাকে বড় করে তোলে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বাচ্চাটিকে দেখাশোনা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজকর্মে সে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে সে অনাথ আশ্রমে যায় কিন্তু আশ্রম থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চাটির সঠিক ধর্ম পরিচয় জানা না গেলে তাকে আশ্রমে নেওয়া যাবে না, কারণ হিন্দুদের অনাথ আশ্রমে হিন্দু বাচ্চা ছাড়া কাউকেই রাখা সম্ভব নয়। রশীদ মুসলমানদের এতিমখানায় গিয়েও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। ইতিমধ্যে রশীদের বাড়িতে বিজু ও তার মা এসে উপস্থিত হন এবং বাচ্চাটিকে কেন্দ্র করে রশীদের নাজেহাল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। বিজুর বাড়িতে শিশুটি বড় হতে থাকে মাঝে মাঝে রশীদ এসে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে বাচ্চাটিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দুপক্ষেরই মনে হয় বাচ্চাটি বিধর্মীদের ঘরে বড় হচ্ছে। উভয় পক্ষই শিশুটির উপর তাদের অধিকার কায়েম করতে উদ্যোগী হয়। শিশুটিকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের ধর্মীয় লড়াই ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত হয়। কোনো পক্ষই শিশুটির উপর অধিকার ছাড়তে রাজি নয় কারণ বাচ্চাদের উপর দাবি তুলে নেওয়ার অর্থ নিজেদের ধর্মের পরাজয়। পরিস্থিতি মামলা মোকদ্দমা অবধি পৌঁছে যায়। আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে বিজু মাতৃস্নেহে বাচ্চাটির উপর অধিকার দাবি করে। কিন্তু বিজুর মাতৃত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত ভাবে এসে পড়ে শিশুটির পিতৃপরিচয়ের প্রশ্ন। বিজু তার সন্তানের বাবার নাম প্রকাশ্যে বলতে পারলেই সন্তানের দায়িত্ব সে পাবে — এই অবস্থায় রশীদ এসে বিজুর পাশে দাঁড়ায় আদালত পক্ষে সর্বজন সম্মুখে শিশুটির পিতৃপরিচয় তথা ধর্ম পরিচয় নিশ্চিত হয়। ফলে শিশুটিও যেমন এক সুন্দর ভবিষ্যৎ পেল তেমনি শিশুটিকে কেন্দ্র করে দুজন ভিন্নধর্মী মানুষ পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের নতুন পথচলা শুরু করল। পরবর্তীতে তাদের সম্পর্ক আইনে মর্যাদা লাভ করে এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়, লেখকের কথায় —

> “এবারে আড়াল থেকে দেবদূতেরা দেখতে পেলে, একটা রেজিস্টারে দুটি হাত নাম সই করছে। হাত দুটি বিজুর আর রশীদের।”[৬]

—এ যেন যথার্থ অর্থেই মানবতার স্বাক্ষর। যাবতীয় ধর্ম পরিচয়কে তুচ্ছ করে দুটি ভিন্নধর্মী মানুষেরা এক হওয়ার সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষের পটভূমিতে মানবতার পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিজু রশীদের এই সাহসী সিদ্ধান্ত এবং সম্পর্কের নতুন সমীকরণ আমাদেরও ধর্মীয় উদারতার শিক্ষা দেয় এবং প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

কৃষ্ণা সবতির *‘ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় বাঁচাবো’* গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষাক্ত পরিবেশে বিপরীত সম্প্রদায়ের আক্রমণের শিকার হয় এক তরুণ দম্পতি। সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত বিশৃঙ্খল জনতার রোষানল তাদের মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। দুজন অল্পবয়সী তরুণ তরুণীর পরস্পরকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার ভেঙে খানখান হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর আঘাতে। দাঙ্গাবাজদের নিষ্ঠুর নির্মম আক্রমণে তরুণীর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চির আশ্বাস বাণী —

> "... ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় বাঁচাবো!"[৭]

—ব্যর্থ হয় সাম্প্রদায়িক শক্তির বলিষ্ঠ কোপ থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে অপারগ হয় তরুণ স্বামী। পরাজিত হয় তার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা, মৃত্যুর পথে লুটিয়ে পড়ে তার প্রিয়তমা। অবশেষে ক্ষতবিক্ষত শরীর ও মন নিয়ে তরুণ যুবকটিকে যাত্রা করতে হয় হিন্দুস্থানের পথে। পথের দুর্ভোগে নিস্তেজ শরীরে মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছায় তার জন্য নির্ধারিত নতুন দেশ হিন্দুস্থানে। জীর্ণ শরীর ও শত যন্ত্রণার মধ্যে তার অবচেতন মন বলে ওঠে —

> "... ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় বাঁচাবো! আমি ...!"[৮]

মানুষের প্রতি মানুষের প্রাণিত কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মৃত্যুর নীরবতায় মিলিয়ে যায়, অসহায় যুবকটি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। সাম্প্রদায়িকতার ক্রূর হিংসার বলি হয়ে অচিরেই দুটো মানুষ জীবনের পথ থেকে হারিয়ে গিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, মৃত্যু ঘটল তাদের যাবতীয় স্বপ্ন সম্ভাবনার।

উর্দু ভাষায় লেখা আজিজ আহ্‌মদের *'কালো রাত'* গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসরূপ উঠে এসেছে। দেশভাগের অব্যবহিত পরে ট্রেন আক্রমণে গজনফরের পরিবারে যে নির্মম পরিণতি নেমে আসে তা আলোচ্য গল্পের উপজীব্য। তৎকালীন সময় গজনফরের পরিবারের মত আরও অসংখ্য পরিবারকে নির্মম পরিণতির শিকার হতে হয়। গজনফরের পরিবারে নির্মম পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে লেখক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহুমাত্রিক ক্ষতকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এক কালো রাতে দিল্লি ও মথুরার মধ্যবর্তী কোনো এক জায়গায় ট্রেন জোর করে থামানো হয়, চালকের আসনে বসে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের লোকেরা। জোর করে মুসলমানদের বাড়ি থেকে ধরে ধরে নামানো হয়, নৃশংসভাবে তাদের কেটে ফেলা হয়। মেয়েদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। গজনফরের বোনকে আক্রমণকারীরা টেনে নিয়ে যায়, নির্মমভাবে খুন হন গজনফরের বাবা এবং মা। তার আর এক ভাই সিকান্দারকে আহত অবস্থায় ট্রেন লাইনে ফেলে দেওয়া হয়। ক্রমাগত হিংসার এই আবহে একটি সম্ভাবনাময় দাম্পত্য সম্পর্কেরও অপমৃত্যু ঘটে। গজনফরের ভাই তাহাওয়ার তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী বাতুলকে নিয়ে এই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ট্রেনে ছিল। সদ্য বিবাহিতা বাতুল হিংসার নির্মম বহিঃপ্রকাশে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, লেখক বাতুলের সন্ত্রস্ত রূপের বর্ণনা করেছেন —

> "সারা গায়ে তার তখন থরথর কাঁপুনি। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই কাঁপুনি ছিল প্রেমের ও কামনার। আজ শুধু মৃত্যুভয়ের।"[৯]

প্রাণ ভয়ে ভীত বাতুল তার স্বামী তাহাওয়ারকে আঁকড়ে ধরে। তাহাওয়ার তার শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অপর সম্প্রদায়ের যৌন আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের হাতে গুলি করে হত্যা করে নিজের ভালোবাসাকে। এই বেদনাঘন অন্তিম মুহূর্তটি লেখকের কলমে ধরা আছে—

> "তাহাওয়ার তার সমস্ত গায়ের ভর দিয়ে জানলাটা আটকে দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিল। বউ তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। নিজের ঠোঁটদুটো বউয়ের ঠোঁটে ঘষে নিয়ে খুব নরম গলায় বলল, "মহাত্মাদের আশ্রয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিই, শান্তিতে যেন থাকে সবাই।"
> "বিদায়।"
> "বিদায়।"
> রিভলবারের মুখটা তার কপালে লাগালো, ঘোড়াটা টিপে দিল। যে দু-হাতে বউ ওর গলা জড়িয়ে ছিল, সেই হাত দুটো ঝুলে পড়ল।"[১০]

এভাবেই সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে সদ্য বিবাহিতা দুটি তরুণ তরুণীর সমস্ত স্বপ্ন সম্ভাবনার অকাল মৃত্যু ঘটল।

আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্বে আলোচিত গল্পগুলো ছাড়াও, দেশ বিভাগের পটভূমি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকদের লেখা বহু ভারতীয় ভাষার গল্পে নরনারী দাম্পত্য জীবনের ভাঙা-গড়া বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর *'সেই ছেলেটা'* গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাতে রাজকুমারী নামক পাঞ্জাবি উদ্বাস্তু তরুণীর দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষের কুটিল সময়ে রাজকুমারী সাধারণ গৃহবধূ থেকে ভিখারিতে পরিণত হয়। তার সন্তান দাঙ্গার সময়কার

অত্যাচারের ফসল। ছেলেটিকে নিয়ে সে তার স্বামী সংসার সন্তান থেকে দূরে সরে যায় — কলঙ্কের সব লজ্জা আর গ্লানি একাকী বহন করে চলে। গুজরাতি ভাষায় লেখা *'টাঙ্গাওয়ালা গুলামদিন'* গল্পে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতা আক্রান্ত হিংসার আবহে কত সহজেই অবিশ্বাস ও অনাস্থার কারণে ভেঙে গেছে দাম্পত্যের নিবিড় বন্ধন। ডোগরি ভাষায় লেখা *'গরহাজির'* গল্পে সাম্প্রদায়িকতা মৃত্যু পরবর্তীতেও মৃত গামা ও তার স্ত্রী ফতিমার আত্মার মিলনে বাধা দেয়। দেশভাগের আগেই মৃত ফতিমা কবরস্থ হয় ভারতবর্ষে অন্যদিকে তার স্বামী গামা পাকিস্তানের মাটিতে আশ্রয় পায়। মৃত্যু পরবর্তীতে প্রাকৃত জগত থেকে অতিপ্রাকৃত জগতে পৌঁছেও গামা এবং তার স্ত্রী মিলিত হতে পারে না। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাগামী শক্তির কাছে তারা পরাভূত হয়। এছাড়াও কুলবন্ত সিং বির্ক-এর পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা *'খেব্বল'*, আর কে নারায়ণের ইংরেজি ভাষায় লেখা *'আর একটা জাত'*, হিন্দি ভাষায় লেখা অমৃত রায়ের *'ব্যথার মঞ্জরী'* গল্পে ইত্যাদি বহুগল্পে নরনারী দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা গড়া বিষয়ীভূত হয়েছে। প্রতিটি গল্প ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লেখকদের দ্বারা রচিত। গল্পগুলো রচনার ভাষা স্বতন্ত্র লেখক ভেদে বিষয়গত, উপাদানগত ও রচনারীতির পার্থক্য রয়েছে, রচনার কালগত ব্যবধানও নিশ্চয়ই আছে। তবে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণেই নর-নারীর নিবিড় দাম্পত্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ছিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হয়। ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তৃত ও বিকৃত রূপ সহজেই উপলব্ধ হয়। আবার কোনো কোনো গল্প সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র আবর্তে সফল দাম্পত্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাদের প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আলোচ্য গল্পগুলো ব্যাপক ও বিস্তৃত সাম্প্রদায়িকতার নিষ্ঠুর ও নির্মম রূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং পাঠকের মনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে উদার, প্রগতিশীল সংবেদনা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।

তথ্যসূত্র:

1. সিং, বেদি রাজিন্দর, 'লাজবন্তী', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১০০
2. সিং, জিত গুরমুখ, 'ঠান্ডা প্রাচীর', *দাঙ্গাবিরোধী গল্প*, সম্পাদনা ও অনুবাদ কমলেশ সেন, ধ্রুপদী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৩৯
3. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন* (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৫০
4. অজ্ঞেয়, 'রমন্তে তত্র দেবতা', *দাঙ্গাবিরোধী গল্প*, ধ্রুপদী, সম্পাদনা ও অনুবাদ কমলেশ সেন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৬০
5. সচদেব, পদ্মা, 'গোরে বহিনজি', *রক্তমণির হারে দেশভাগ-স্বাধীনতার ভারতীয় গল্প সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), সংকলন ও সম্পাদনা দেবেশ রায়, অনুবাদ গৌতম সেনগুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃ. ২৮১
6. চুগতাই, ইসমৎ, 'বাচ্চা', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ রজত চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০৩
7. সবতি, কৃষ্ণা, 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় বাঁচাবো', দেশভাগের *গল্প হিন্দি*, অনুবাদ জাভেদ ইকবাল এবং মোস্তাফা আজিজ জয়, জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ১৫
8. তদেব, পৃ. ১৭
9. আহ্‌মদ, আজিজ, 'কালো রাত' *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ সৌরীন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২২০
10. তদেব, পৃ. ঐ